কেঁচো সার উৎপাদন
চরাঞ্চলে একটি সফল উদ্যোগ

বদলে যাচ্ছে
নারীদের জীবনচিত্র

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)

পটভূমি

পাইবান্ধা বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ একটি জেলা যেখানে প্রতিবছর বন্যা, খরা, নদী-ভাঙ্গনসহ প্রাকৃতিক বিভিন্ন প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এই জেলার ৪টি উপজেলায় (সদর, সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি ও সাঘাটা) নতুন পুরাতনসহ প্রায় ১৫২টি চরের মধ্যে ৭০ ভাগ চরেই বসবাস করে প্রায় ১.২ লক্ষ্য পরিবার। এসকল পরিবারগুলোর অধিকাংশই নদীভাঙ্গনকৃত স্থানান্তরিত পরিবার যারা নদীগর্ভে সহায় সম্বল হারিয়ে দারিদ্রতা আর অভাব-অনটনের মধ্যদিয়ে জীবন-জীবিকা অতিবাহিত করছে। এদের মধ্যে প্রায় ৭২ শতাংশ পরিবারই দরিদ্র কৃষক, অতি-দরিদ্র দিনমজুর, বর্গাচাষীসহ বিভিন্ন নিম্ন শ্রেণীর পেশায় নিয়োজিত।

এক নজরে রিভার প্রকল্প

পাইবান্ধা জেলার অন্তর্গত ফুলছড়ি উপজেলার ফজলুপুর, ফুলছড়ি ও উড়িয়া, এই তিনটি ইউনিয়ন যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর সংলগ্ন বালুময় চরের উপর এই ইউনিয়নগুলোর অবস্থান। প্রতিবছর বন্যা, নদী ভাঙ্গন, খরাসহ প্রাকৃতিক বিভিন্ন প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে এসব ইউনিয়নের জনগোষ্ঠী জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে। বিভিন্ন এলাকা থেকে নদীভাঙ্গনকৃত পরিবারগুলো মূলতঃ স্থানান্তরিত হয়ে এসব ইউনিয়নে বসতি গড়ে তোলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাব ছাড়াও এসব এলাকায় কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ না থাকায় অভাব ও দারিদ্র্যতার কষাঘাতে তাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তদুপরি এসব এলাকার মানুষেরা নিজেদের উন্নয়নে একটা সময় এসে কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নেয়। তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অর্থনৈতিক সম্বল হয়ে উঠে কৃষি। বেঁচে থাকার তাগিদে কৃষি ক্ষেত্রে অধিক ফলনে তাদের মনে-প্রাণে আশার সঞ্চার করে আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সেই প্রাণে নেমে আসে হতাশা আর দুর্দশা।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)

গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের নিভৃত গ্রাম রাধাকৃষ্ণপুরের দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা নারী ও পুরুষদের সংগঠিত করার মাধ্যমে ১৯৮৫ সালে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) উন্নয়ন কার্যক্রমে পথ চলা শুরু করে। প্রাথমিকভাবে মূলত দরিদ্র ও দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সঘনিত উন্নয়নে লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে।

সকল দরিদ্র নারী, পুরুষ ও শিশুর জন্য জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, ক্ষুদ আদিবাসী ও প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা ও পরিবেশ উন্নয়ন, স্থায়িত্বশীল ও দুর্যোগ সহায়ক কৃষি ব্যবস্থাপনা, কর্মমুখী ও কারিগরি শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগী দক্ষতা সৃষ্টি, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়ন, সুশাসন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে সংস্থাটি। সংস্থাটি ইতিমধ্যে উন্নয়ন পরিধিতে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং সেই সাথে উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার, স্থানীয় সরকার, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজসহ সকলের সাথে সুসম্পর্কের মাধ্যমে জিইউকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। স্থানীয় জনগনের চাহিদা অনুযায়ী সংস্থাটি বর্তমানে গাইবান্ধা জেলার বাইরে রংপুর বিভাগের রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, নীলফামারি এবং কুষ্টিয়া জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে মোট ৮টি জেলার ৩২টি উপজেলায় প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার পরিবারের সাথে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

এমন একটি সময়ে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) তাদের অবস্থার কথা মাথায় রেখে দলে দলে সুসংগঠিত করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। এমডিজি-১ এবং জাতীয় দুর্যোগ কর্ম পরিকল্পনার (২০১০-২০১৫) কৌশলগত লক্ষ্য-৪ এবং ৫ অর্জনে ভূমিকা রাখতে এসব প্রতিকূল অবস্থাগুলোকে বিবেচনা করে GUK, দাতা সংস্থা Christian Aid-এর আর্থিক সহায়তায় ফুলছড়ি উপজেলার ফজলুপুর, ফুলছড়ি ও উড়িয়া ইউনিয়নের ১৫শ' পরিবার নিয়ে ২০১০ সালের জানুয়ারি মাস হতে Resilience Improvement of Vulnerable Extreme Riparian (RIVER) নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে এখন পর্যন্ত চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের প্রাথমিক অবস্থায় তাদের সু-সংগঠিত করে প্রয়োজনীয় সচেতনতা, জ্ঞানবৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া তাদের চাহিদা মাফিক আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। এসব উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মাধ্যমে সদস্যদের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নে বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নসহ আয়বর্ধকমূলক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করানো। চরের অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র। তাদের প্রধান আয় ও কর্মসংস্থানের একমাত্র পথ কৃষিপণ্য উৎপাদন ও কৃষিকাজ। তাদের নিজস্ব আবাদী জমির পরিমাণ খুবই কম হওয়ায় বা না থাকায় অন্যের জমিতে বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করতে হয়। তাদেরকে অন্যের জমিতে কৃষি শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় অথবা অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করতে হয়।

কেন এই কার্যক্রম

চাষাবাদ করতে গিয়ে দেখা যায় কৃষকদের ফসল উৎপাদনে সেচ ও সার প্রয়োগর জন্য সবচেয়ে বেশি খরচ হয়। ফলে তারা সেভাবে লাভবান হতে পারে না। আবার এ অঞ্চলে কৃষি পণ্য উৎপাদনের পিছনে নারী শ্রমিকদের অবদান সবচেয়ে বেশি কিন্তু সে অনুযায়ী তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক হতে বঞ্চিত হয় যা তাদের মাঝে হতাশা ও কর্মবিমুখতা সৃষ্টি করে। এসব প্রতিকূল পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এই প্রকল্পের আওতায় সহজ ও স্বল্প খরচের মাধ্যমে অধিক ফলন ও একই সাথে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নারী কৃষি শ্রমিকদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র দরিদ্র মানুষের সাথে একমাত্র ভরসা হিসেবে ভার্মি কম্পোষ্ট কার্যক্রমটি গ্রহণ করা হয়।

সংস্থা বিশ্বাস করে, দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে প্রতিটি পরিবারেই আয়বর্ধকমূলক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকা প্রয়োজন। এছাড়া ক্রমাগতভাবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে পরিবেশ উন্নয়নে কার্যকরি ভূমিকা রাখা অতীব জরুরি। এসকল নেতিবাচক প্রভাব থেকে উত্তোরণ ও পাশাপাশি পরিবারভিত্তিক অতিরিক্ত আয় অর্জনে কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোষ্ট এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন তথ্যসূত্র বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা, বই-পুস্তক ও ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করে কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোষ্ট সম্পর্কে সংস্থা যথেষ্ট জ্ঞান ও ধারণা লাভ করে উক্ত প্রকল্পের আওতায় কেঁচো সার বা ভার্মি কমপোষ্ট কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। ঘরে বসে যে কোন নারী শ্রমিক স্বল্প পরিশ্রম ও খরচে এই কার্যক্রমটির মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজের জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারবে, অন্যদিকে তা বিক্রয় করে অতিরিক্ত আয় করে নিজের পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে পারবে।

সমসাময়িক চিত্র

এই কার্যক্রমটি প্রাথমিক অবস্থায় ফুলছড়ি উপজেলার ফজলুপুর ইউনিয়নে বাজে তিলকুপি গ্রামের গোলাপ ফুল মহিলা সমিতির সদস্য ফুয়ারা বেগমকে দিয়ে শুরু করা হয়। বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় মোট ৩০টি দলের ৪০০ জন সদস্যদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে এই কার্যক্রমটি চলমান রয়েছে। ভার্মি কম্পোষ্ট চরাঞ্চলের প্রেক্ষাপটে নিজ বাড়িতে স্বল্প পরিশ্রম ও পুঁজিতে অধিক ফসল ও অতিরিক্ত আয় করার একটি সহজ উপায় হিসেবে ইতিমধ্যে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর বাইরেও বেশ সাড়া ফেলেছে। যদিও প্রথমদিকে কেঁচো নিয়ে কার্যক্রমটির প্রতি অনেকেরই আড়ষ্টতা কাজ করে কিন্তু ধীরে ধীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শণী দেখে এই কার্যক্রমের প্রতি এলাকার অনেকেরই আগ্রহ তৈরি হয়। এই কার্যক্রমের সহজ পদ্ধতি, স্বল্প খরচ ও অতিরিক্ত আয় করার সুযোগের কারণে এই এলাকায় ভার্মি কম্পোষ্টের সফলতা ও জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

সংস্থা কর্তৃক পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে যে এই কার্যক্রমটির সাথে যুক্ত থাকায় অনেক পরিবারেই দারিদ্র্যতা হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে; ফিরে এসেছে স্বচ্ছলতা। একজন নারী তার সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম সেরে এই কার্যক্রমের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারে। পাশপাশি সে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে ভার্মি কম্পোষ্ট ব্যবহার করে খরচ কমিয়ে অধিক ফসল ঘরে তুলতে পারছে। অন্যদিকে তারা আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকে নিজ পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করতে পারছে। কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোষ্ট চরাঞ্চলের নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে একটি লাভজনক ও সহজসাধ্য কার্যক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সংস্থা আশাবাদী যে খুব দ্রুত এর বিস্তৃতি ঘটবে এবং দরিদ্র, অতি-দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোস্ট : কর্ম কৌশল, পদ্ধতি ও উপকরণ

ভার্মি কম্পোষ্ট বা কেঁচো সার কি?

গরু, মহিষ, ভেড়া ও ছাগলের গোবর নির্দিষ্ট জাতের নির্দিষ্ট সংখ্যক জীবন্ত কেঁচোর সাথে একত্রে একটি পাত্রে রেখে দিলে কেঁচোগুলো ঐ গোবর খেয়ে জীবন ধারন করতে থাকে এবং তাদের মলমূত্র জমা হতে থাকে যা সার হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠে। অথাৎ কেঁচো দ্বারা খাইয়ে কেঁচোর মলমূত্র আকারে যে সার পাওয়া যায় তাঁকে ভার্মি কম্পোষ্ট বা কেঁচো সার বলা হয়।

কেঁচো-এর ধরন

প্রকৃতিতে কেঁচোসমূহ ৩টি প্রজাতিতে ১. এপিজিক প্রজাতি ২. এক্রোটিক প্রজাতি ও ৩. লোকাল প্রজাতি। তবে কেচোঁ সার বা ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরিতে নিম্নলিখিত এপিজিক প্রজাতির কেঁচো ব্যবহার করা হয়। যেমন- লিটার খাদক, ছোট দেহ, লাল বাদামী রং ও লাল কেঁচো, লাল উইগলার, টাইপার কেঁচো এবং ম্যানিটর কেঁচো। যে সকল এলাকায় এই ধরনের কেঁচো প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানে এর কার্যকারিতা বা কার্যকরি ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছে।

চরাঞ্চলের প্রেক্ষিতেও এই কার্যক্রমের কার্যকরি কোন ফলাফল পাওয়া গেছে। কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদনের জন্য মোট ৩টি ধাপ অনুসরণ করতে হয়। ধাপগুলো যথাক্রমে (i) ভার্মিকালচার (Vermiculture), (ii) ভার্মিকম্পোষ্টিং (Vermi Composting) এবং (iii) ভার্মি প্রিজারভেশন (Vermi preservation)। ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে।

উৎপাদন পদ্ধতি

ভার্মি কমপোষ্ট তৈরিতে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়:

ধাপ-১ : প্রথমে সংগৃহীত নান্দা বা চাড়ির ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পরিমাণ মত কাঁচা গোবর সংগ্রহ করে পলিথিন/মেঝের উপর একত্রে ৫/৬ দিন গাদা করে পলিথিন বা চট দিয়ে ঢেকে রাখুন। তারপর আগলা করে গোবর উল্ট পালট করে এর কাঁচা গন্ধ বের করে দিতে হবে। এ সময়ে গোবর আংশিক পঁচে যাবে।

ধাপ-২ : ঐ আংশিক পঁচা গোবর চাড়ির ২ ইঞ্চি খালি রেখে ভরে দিতে হবে।

ধাপ-৩ : নির্দিষ্ট প্রজাতির গোবর খাদক কেঁচো সংগ্রহ করে গোবরের উপর ছেড়ে দিতে হবে এবং হালকাভাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। পানি বেশি হলে যেমন কেঁচো মারা যাবে তেমনি পানি শুকিয়ে গেলেও কেঁচো মারা যাবে।

ধাপ-৪ : পোকা-মাকড় (পিঁপড়া, উইপোকা, মুরগি, ব্যাঙ্গ, ইঁদুর, হাঁস ও বিভিন্ন পাখি) থেকে রক্ষার জন্য চাড়ি নেট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

ধাপ-৫ : এই সার তৈরি হওয়ার সময়কাল নির্ভর করে কেঁচোর সংখ্যার উপর। ১৫০ কেজি গোবরের জন্য উপর্যুক্ত পরিবেশে ৫ হাজার কেঁচো ছাড়লে ২৫-৩০ দিনের মধ্যে ৬৫ কেজি ভার্মি কম্পোষ্ট বা কেঁচো সার তৈরি হবে।

ধাপ-৬ : কেঁচো স্বাভাবিক নিরাপত্তা ও প্রক্রিয়ার জন্য চাড়ির উপর চটের ঢাকনা দিতে হবে।

ধাপ-৭ : গোবরে কেঁচো ছাড়ার পর গোবর নাড়াচাড়া করা যাবে না কারণ এতে কেঁচো মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ধাপ-৮ : চাড়ির ভিতর পিঁপড়া বা অন্য কোন পোকা মারার জন্য কীটনাশক, ব্লিচিং পাউডার, পেট্রোল ইত্যাদি কিছুই ব্যবহার করা যাবে না।

ধাপ-৯ : ছায়াযুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য জায়গায় চাড়িটি স্থাপন করতে হবে।

ধাপ-১০ : ব্যস্ত রাস্তা বা কম্পন সৃষ্টিকারী কোন কারখানার পাশে চাড়ি বসানো যাবে না।

ব্যবহার ও মাত্রা

১. কেঁচো সার সব ধরনের ফসলে ব্যবহার করা যায়।

২. চাষ দিয়ে জমি তৈরি করার সময় পরিমাণমত কেঁচো সার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

৩. কেঁচো সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম বছর উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় বছর এর দুই তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয় বছরে অর্ধেক প্রয়োগ করতে হবে। তবে মাটির অবস্থা ও ফসলের চাহিদা মাফিক প্রয়োজনে রাসায়নিক সার নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করলে অধিক ফলন পাওয়া যাবে।

৪. নিয়মিত কেঁচো সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিয়ে দিলেও কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায় এবং জমির উর্বরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

বছর	কেঁচো সারের পরিমাণ	জমির পরিমাণ
১ম বছর	১৫ কেজি	১ শতাংশ
২য় বছর	১০ কেজি	১ শতাংশ
৩য় বছর	৭.৫ কেজি	১ শতাংশ

সুবিধাসমূহ

১. মাটির উপর প্রভাব

- ✓পানির ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- ✓নাইট্রোজেন হ্রাস রোধ করে।
- ✓ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক গুণাগুণ বৃদ্ধি করে।
- ✓অনুক্ষরের ভারসাম্য ঠিক রাখে।

২. ফসলের উপর প্রভাব

- ✓বীজের অঙ্কুরোদগম ও ফসল বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে এর উৎপাদন বৃদ্ধি করে।
- ✓শিকড় বৃদ্ধি ও গঠনকে শক্তিশালী করে।
- ✓মাটিতে প্রয়োজনীয় হরমোন যেমন অক্সিন ও জিবরালিক এসিড যোগ করে।
- ✓সেচের চাহিদা অনেকাংশে হ্রাস করে।

৩. অর্থনৈতিক সুবিধা

- ✓উৎপাদন খরচ কমায় এবং ফলনবৃদ্ধি করে।
- ✓কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।
- ✓তুলনামূলক সহজ প্রযুক্তি হওয়ায় কেঁচো সার এদেশের কৃষিতে ব্যবহারের জন্য উপযোগী।

৪. পরিবেশগত সুবিধা

- ✓গ্রীনহাউস গ্যাস (মিথেন, কার্বনডাই অক্সসাইড ও নাইট্রিক অক্সসাইড) নির্গমন হ্রাস করে।
- ✓রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস করে জমির কৃষির পরিবেশগত উপযোগিতা বৃদ্ধি করে।
- ✓বর্জ্য পদার্থ-জৈব পদার্থের রূপান্তরিত হওয়ার কারণে জমিতে বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায়।

আর্মী কম্পোস্ট-এর আয়ের ও ব্যয়ের সারণী

একটি গরু হতে ১৫০ কেজি গোবরে ৫ হাজার কেঁচো ব্যবহার করলে ২৫-৩০ দিনের মধ্যে ৬৫ কেজি সার পাওয়া যাবে। ১টি চাড়ি থেকে বছরে ৮ বারে মোট ৪শ' ৮০ কেজি কেঁচো সার উৎপাদন করা যায়। আবার, কেঁচোর বংশবৃদ্ধি চক্রাকার হওয়ায় প্রতি মাসে কেঁচোর সংখ্যা দ্বিগুণ হবে অর্থাৎ ১ বছরের ন্যূনতম ৮০ হাজার কেঁচো হবে।

ব্যয়			আয়	
ক্রমনং	উপকরণ (পরিমাণ)	টাকা	পরিমাণ	টাকা
০১	কাঁচা গোবর ১৫০ কেজি (নিজস্ব)	------	কেঁচো সার (৬০ কেজি×৮ বার = ৪৮০ কেজি) প্রতি কেজি ১০ টাকা দরে = ৪৮০× ১০ =৪,৮০০.০০	৪,৮০০.০০
০২	চাড়ি/ রিং ১টি	২০০.০০		
০৩	নেট	৫০.০০		
০৪	কেঁচো ৫০০০টি	৫,০০০.০০		
০৫	চটের বস্তা ১টি	৭০.০০	প্রতিটি কেঁচো ১.০০ টাকা দরে বছরে ২০,০০০ কেঁচো বিক্রি	২০,০০০.০০
০৬	চালুনি ১টি	১৫০.০০		
০৭	অন্যান খরচ	২০০.০০		
	মোট	৫,৬৭০.০০		২৪,৮০০.০০

জীবিকায়নের নতুন মাত্রায় ছায়ারানী বেগম

গাইবান্ধা শহর থেকে ১৫ কিঃমিঃ দূরে ব্রহ্মপুত্র নদের ছোট শাখা পেরিয়ে ফজলুপুর ইউনিয়নের বাজেতেলকুপি চরে ৩ ছেলে ১ মেয়ে নিয়ে ছায়ারাণীর সংসার। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখার সময় মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে দিনমজুর স্বামী মোজাহার মিয়ার সাথে তার বিবাহ হয়। স্বামীর সংসারে এসে সে অভাব-অনটনের মধ্যে পড়ে। তার উপর পরপর ২ বার নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে পরিশেষে বাজেতেলকুপি চরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।

এমনই একটি সময় ক্রিশ্চিয়ান-এইড এর সহযোগিতায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) রিভার নামক প্রকল্পের মাধ্যমে বাজেতেলকুপি গ্রামে কার্যক্রম শুরু করে। সেই সময় ছায়ারাণী বেগম সদস্য হিসেবে গোলাপ মহিলা সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হন। সমিতির মাধ্যমে সাপ্তাহিক সভায় অংশগ্রহণ, সঞ্চয় ও ঝুঁকি তহবিল জমা প্রদান, বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণসহ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেকে উৎপাদনমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়। প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সে তার নিজ বাড়িতে একটি রিং এর মাধ্যমে কেঁচো সার উৎপাদন শুরু করেন। এভাবে তিন মাস পর তার কেঁচোর পরিমাণ দ্বিগুণ হলে দুইটি রিং দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু করে। সহজ পদ্ধতি ও স্বল্প খরচে তার উৎপাদিত কেঁচো সার বসতবাড়ির সব্জি বাগানে প্রয়োগ করে এর অভাবনীয় সাফল্য দেখতে পায়। এতে তার কেঁচো সার উৎপাদনের আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। এভাবে নিজ বাড়িতে সে দুইটি হতে চারটি এবং বর্তমানে ৬টি রিং-এর মাধ্যমে কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদনের ক্ষুদ্র খামার তৈরি করে।

তার খামারে কেঁচোর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে যা বিক্রি করে সে অতিরিক্ত আয় করা শুরু করে। প্রথমে ২ হাজার কেঁচো ১ হাজার টাকায়, কিছুদিন পর ৪ হাজার ৫শ' কেঁচো ২ হাজার ২শ' ৫০ টাকায় এবং এ পর্যন্ত প্রায় ২০ হাজার কেঁচো ও ২৫ মন কেঁচো সার বিক্রি করে সে আনুমানিক ১২ হাজার ৫শ' টাকা আয় করতে সামর্থ হয়। এই আয় দিয়ে সে তার পরিবারের উন্নয়নের পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে ব্যয় করতে পারছে। তার এই উৎসাহে বাজেতেলকুপি গ্রামের অনেক নারীই কেঁচো সার উৎপাদনের সাথে যুক্ত হয়ে সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে কার্যকরি ভূমিকা রাখেছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছায়ারাণীর বলে

'আগামীতে আমি মোট ১০টি রিং দিয়ে কেচো সার উৎপাদনে ক্ষুদ্র কেঁচো খামার তৈরি করবো যা দিয়ে নিজেদের চাষাবাদের চাহিদা মিটিয়ে লাভজনক আয় উপার্জন করতে পারবো। দরিদ্র নারীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কোন বিকল্প নাই।'

নব-উদ্যমে উন্নয়নের ছোঁয়ায় ফোয়ারা বেগম

স্বামী জোব্বার মিয়া ও ৩ ছেলেমেয়ে নিয়ে ফোয়ারা বেগমের সংসার। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে দিন মজুর স্বামী জোব্বার মিয়া সাথে তার বিয়ে হয়। স্বামীর বাড়িভিটা নদীতে বিলীন হয়ে যাওয়ায় বাবার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদিকে দারিদ্র্যতা অন্যদিকে নদী ভাঙ্গনের কারণে হাজার প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। ২০১০ সালে বাজেতেলকুপি চর জেগে উঠলে সে তার পরিবার নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেন।

ঠিক এমন সময় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) ক্রিশ্চিয়ান-এইড এর সহযোগিতায় রিভার নামক প্রকল্পের কার্যক্রম বাজেতেলকুপি গ্রামে শুরু করে। সেই সময় ফোয়ারা বেগম গোলাপ মহিলা সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার বুদ্ধিমত্তা ও নেতৃত্বদানের সমক্ষতার কারণে সকলের সম্মতিতে সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়। তিনি সমিতিতে সাপ্তাহিক সভা, মতামত প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ সঞ্চয় ও ঝুঁকি তহবিল গঠনে নেতৃত্ব প্রদান করে এবং পাশাপাশি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণসহ আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়।

প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালে নতুন কার্যক্রম হিসেবে ভার্মি কম্পোষ্ট বা কেঁচো সার উৎপাদন শুরু হয়। এই সার উৎপাদনের মাধ্যমেই ফোয়ারা বেগমের পরিবারে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগতে শুরু করে। সে প্রথমে ১টি রিং এর মাধ্যমে ভার্মি কম্পোষ্ট বা কেঁচো সার উৎপাদন শুরু করে তা পরবর্তীতে চাহিদা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই লাভজনক কেঁচো সার উৎপাদনের জন্য সে ধীরে ধীরে রিং এর সংখ্যা বাড়াতে থাকে। এই সার ব্যবহার করে অনেক বেশি ফলন পাওয়ার কারণে সমিতির সদস্যসহ এলাকার অন্যান্য সবার মাঝেই এ সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ফোয়ারা বেগম ৩০ হাজার কেঁচো বিক্রি করে প্রায় ১৫ হাজার টাকা আয় করেন। পরবর্তী ২ বছরে সে তার বাড়িতে ভার্মি কম্পোষ্ট বা কেঁচো সার ক্ষুদ্র খামার তৈরি করে এই সার উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে সে এলাকাসহ বাইরের বিভিন্ন জেলার সংস্থাগুলোতে কেঁচো সরবরাহ করছে। এ পর্যন্ত তিনি ৬০ হাজার কেঁচো ও ৪০ মন সার বিক্রি করে প্রায় ৫৪ হাজার টাকা আয় করে। ফোয়ারা বেগম তার পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার কারণে অতি অল্প সময়ে নিজের উন্নয়ন করতে পেরেছেন। সে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)-এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন–

'কর্মসংস্থান এর সুযোগ ও পরিবেশ থাকলে নারীরা আয়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় স্বল্প খরচের এই জৈব সার মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকরি ভূমিকা রাখে।'

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশে কেঁচো সার তৈরি ও এর ব্যবহার খুবই লাভজনক। বিশেষ করে চরাঞ্চলের প্রেক্ষাপটে ছয়মাস কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ থাকে না বলে নারী কৃষকদের জন্য কেঁচো সার কর্মসংস্থানের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে যা তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এতে করে একদিকে যেমন কৃষির পরিবেশগত উপযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সহজ হবে অন্যদিকে পরিবারভিত্তিক অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ভার্মি কম্পোষ্ট
করব চাষ
অধিক ফলন
১২ মাস

প্রকাশনায়
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)
নশরৎপুর, পোস্ট বক্স-১৪, গাইবান্ধা-৫৭০০
ফোন : +৮৮ ০৫৪১-৮৯০৪২
সেল ফোন: +৮৮ ০১৭১৩৪৮৪৬৯৬
ইমেইল: info@gukbd.net
ওয়েব সাইট: www.gukbd.net
ফেসবুক: www.facebook.com/gukgaibandha